কমলপত্র

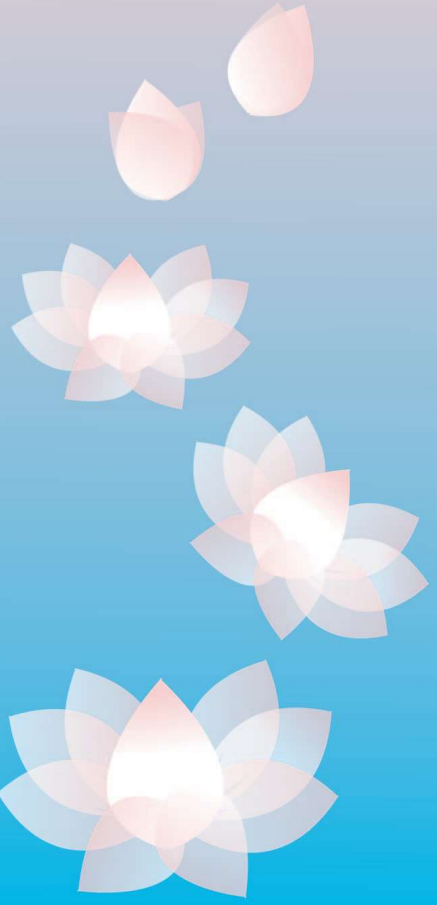

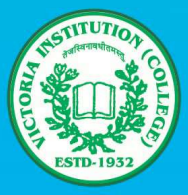

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)

২০২৪

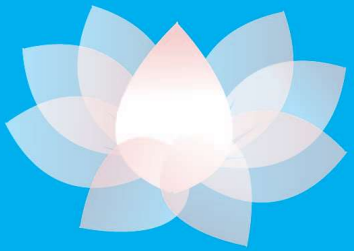

কমল পত্র

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)

৭৮বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রার্থনা

ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

রক্ষিত হোক গুরু শিষ্য দুইজন সমভাবে
জ্ঞান শক্তি সমান ভাবে ঔজ্জ্বল্য পাবে,
হে ব্রহ্ম, গুরু শিষ্য দুজনে যেন পারি
বিদ্যাফল লাভে হতে সম অধিকারী
প্রজ্ঞা-বলে তেজস্বী আর সম উদ্বোধিত,
ঈর্ষা যেন কলঙ্কিত করে না দোঁহে, পিতঃ

O God—
May knowledge permeate and protect both of us (teacher and disciple)
in equal measure.
May both of us enjoy the fruits of knowledge in equal measure.
May our acquired knowledge be imbued with spirit and valour and
invigorate both of us in equal measure.
May there never be any malice between us.

অধ্যক্ষার কলমে

ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজ — এই প্রাতিষ্ঠানিক নামের থেকেও আরও আন্তরিক একটি নামে এই প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে চিহ্নিত — কমলকুটির। কমলকুটির শুধু একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি স্বপ্নের নাম। যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজ সংস্কারক, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারক, অনন্ত গুণে ভূষিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

তাঁর বাসভবন এই কমলকুটির। তাই আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনের নাম কমলপত্র। 'কমলপত্র' ভিক্টোরিয়া পরিবারের মুখপত্র। ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনী — সবার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই পরিবারের মনের কথায় সমৃদ্ধ 'কমলপত্র' সফলতর, সফলতম হোক।

ড. মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল
অধ্যক্ষা

সম্পাদকীয়

দীর্ঘদিন কেটে গেলো। এই কমলকুটিরে। বত্রিশ বছর। অবসর এ বছরই। সম্পাদকীয় লিখছি শেষবারের মতো 'কমলপত্র'র জন্য। কমলকুটির আমার দ্বিতীয় বাসগৃহ। কমলপত্র আমার আদরের ছাত্রীদের ও আমার স্নেহের সহকর্মীদের প্রতিভা- স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।

এবারের 'কমলপত্র' সেজে উঠেছে প্রতিবারের মতোই বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি লেখায়। রয়েছে ছাত্রীদের আঁকা বেশ কিছু ছবি — যা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। শুধু ছাত্রীদের নয়, আছে অধ্যাপিকা প্রকৃতি দাসের আঁকা ছবি, যে ছবিকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে অধ্যাপিকা পর্ণশবরী ভট্টাচার্য্যের লেখা।

ছাত্রীদের লেখা বাংলা, ইংরেজি কবিতার পাশাপাশি রয়েছে অধ্যাপিকা জামিলাতুল ফেরদৌসের কবিতা।

কবিতা ও ছবির মধ্যে মেলবন্ধনের প্রয়াস আছে এই পত্রিকায়।

ছাত্রীদের আঁকা ছবিকে কখনও ঋদ্ধ করেছে অধ্যাপক নন্দন সাহার লেখা বা অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা খাঁড়ার কবিতা; আবার ছাত্রীদের আঁকা ছবি কখনও হয়ে উঠেছে ছাত্রীদের লেখা কবিতার পরিপূরক।

রয়েছে দুই প্রাক্তনীর মূল্যবান স্মৃতিচারণ।

'কমলপত্র' সমৃদ্ধতর, সফলতর হোক।

এ আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ

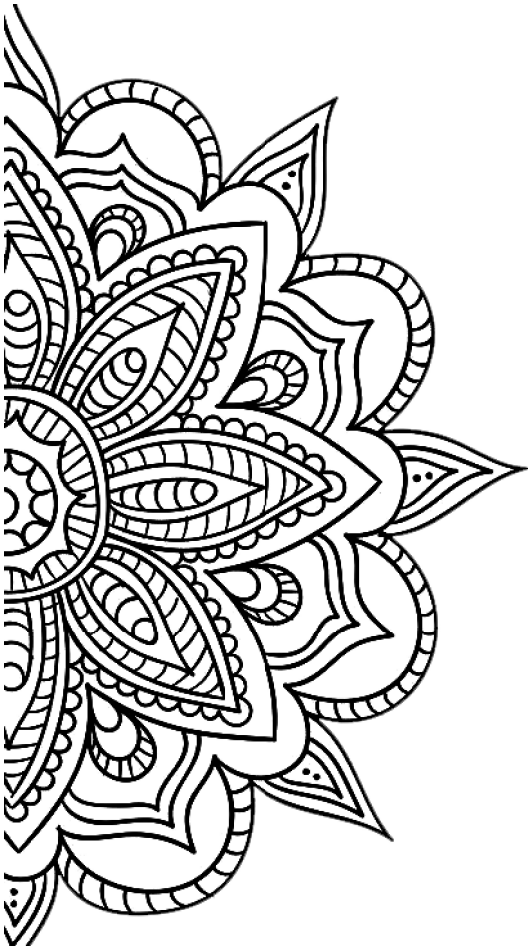

ম্যাগাজিন কমিটি

ড. মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল (অধ্যক্ষা)
ড. উমা রায় শ্রীনিবাসন
ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী
ড. ফারহাত আরা কাহেকাশা
ড. পর্ণশবরী ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতি অনুরাধা বসু
ড. দেবযানী দাস ঘোষ
ড. কস্তুরী মজুমদার
ড. শ্রাবণী পাল
ড. মধুমিতা বসু
ড. শুচিস্মিতা খাঁড়া
শ্রীমতি প্রকৃতি দাস
ড. ঈশিতা সাহা
শ্রী নন্দন সাহা
শ্রী আদিত্য সরকার

সূচীপত্র

অধ্যক্ষার কলমে		১
সম্পাদকীয়		২
ম্যাগাজিন কমিটি		৩

বাংলা

অভিসার — আজও	স্নেহা বসাক	৫
ইচ্ছে	অরিত্রা বোস	৬
পুরুল্যা — তোমাকে	মৌমী সরকার	৬
বিস্মৃতির আড়ালে অগ্নিপুরুষ	নন্দন সাহা	৭
জীবনের জলছবি	স্নেহা বসাক	১১
একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু	জামিলাতুল ফেরদৌস	১৫
নেতাজীর প্রতি	অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা খাঁড়া	১৬
কুমোরটুলির গল্প	অন্তরা গোস্বামী	১৮
স্রোতস্বিনী	সানন্দা চৌধুরী	২০
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে	আণবিকা গঙ্গোপাধ্যায়	২২
নস্টালজিয়া	অপরূপা চ্যাটার্জ্জী	২৬

English

Jagannatha Cult	Dr. Parnasabari Bhattacharyya	10
Dead Hearts	Bidisha Chakraborty	29
B(Lame) Game	Aindrila Chakraborty	30
Inferiority Complex	Abhilasha Parui	31
The Night Bird Sings	Sucharita Chowdhury	32
Running Away?	Bidisha Chakraborty	33
Destination Kala Pani	Sreya Das	34

Urdu

Safar Nama Iraq Aur Iran	Smt Neeloofar Nabi	1
Taraqqi Pasand Tehrik Aur Urdu Shayari	Sufia Sabir	4
Halqa e Arbab e Zouq Ki Tehrik	Nousaba Khatoon	6
Hindustan Mein Taa'nisi Tehrik	Joya Firdous	8
Kaash	Ismat Parveen	11

প্রচ্ছদ — আত্রেয়ী পাল

অভিসার — আজও

স্নেহা বসাক
চতুর্থ সেমিস্টার ● ইতিহাস অনার্স

শহরের এই নরম সন্ধ্যে বেলায়
চাঁদের আলোয় সারাটা আকাশ ভেজা,
বাষ্প জমে মনের গোপন কোণায়
উষ্ণতা বাড়ে বুকপকেটের খোঁজে ...

চোখের কোণায় স্মৃতির কাটাকুটি,
আস্কারা দেয় আকাশ, চোরা হাওয়া;
ওই দূরেতে তারাদের খুনসুটি –
মন্দবাসার মিথ্যে এ গান গাওয়া।

তোমার খামখেয়ালি প্রতিশ্রুতির তরে
অন্ধ কানাই আজও কী গান গায়?
চালচুলোহীন কাব্যগুলো নিয়ে
সেই কিশোরী মালা গাঁথতে চায়?

এমনই এক তপ্ত সন্ধ্যা-রাতে
জড়িয়ে নিয়ে আদর-পশম তার,
ঠোঁটের ভাঁজে মন ডুবিয়ে রেখে
বিষন্নতার নিত্য অভিসার।

শেষ প্রহরের রাত্রে আজও তাই
চোখ ভিজে যায় ক্লান্ত অবসাদে;
মন-কাগজের নৌকো তবু ভিড়ে
ছোঁয়াচ সামলে একলা ভেসে চলে।

ছবি— মেঘা মণ্ডল ● ষষ্ঠ সেমিস্টার ● ইতিহাস অনার্স

ইচ্ছে

অরিত্রা বোস
দ্বিতীয় সেমিস্টার ● ভূগোল অনার্স

বহুদিনের যাত্রা শেষে
দুয়ার পানে চাই,
দিনের আলো নিভু নিভু
সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালাই।

তখনও কী দাঁড়িয়ে তুমি
অজানা অপেক্ষায়,
দূরে কোথাও ফেরিওয়ালার
বাঁশি শোনা যায়।

কত রঙিন স্বপ্ন ছিল
ওই দুই কালো চোখে,
কাজল আজো চোখেই আছে
স্বপ্ন মরে শোকে।

ক্লান্ত চোখের মণি দুটি
আজও কী পথ চেয়ে!
জানো কি আর ফিরবো না
স্বপ্নতরী বেয়ে।

আবার হয়তো মিলব কোনো
অজানা রাজপথে,
কালচক্র ওলোট পালোট
মিলবো না বাঁধা গতে।

পুরুল্যা — তোমাকে

মৌমী সরকার
প্রথম সেমিস্টার ● ইতিহাস অনার্স

(১)
ফাগুন দিয়েছে ঢেলে; লাল
পুরুল্যের কপালে আজ —
সিঁদুর রাঙানো কপাল
সিঁথির বাহারে সাজ।

(২)
ফাগুনে তো আগুন লেগেছে
ভালোবেসে জ্বলছে পুরুল্যে!
ভালোবেসে বুকটা জ্বলেছে —
ভালোবেসে সবাই কি জ্বলে!!

বিস্মৃতির আড়ালে অগ্নিপুরুষ

নন্দন সাহা
সহকারী অধ্যাপক ● রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

কেশবচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর কলকাতার কলুটোলায়। ঠাকুরদা রামকমল সেন ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সম্পাদক। শৈশবেই পিতাকে হারান, তবে মা সরলা সুন্দরী দেবীর গভীর প্রভাব ছিল কেশবচন্দ্রের চরিত্র গঠনে। হিন্দু কলেজে পড়াশোনা কালেই জেমস লং, চার্লস ডাল প্রমুখ মিশনারি প্রচারকদের সংস্পর্শে আসেন তিনি। থিওডর পার্কার গভীরভাবে প্রভাবিত করেন তাঁকে। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই ঈশ্বরচিন্তা এবং ধর্ম সংগঠনের ইচ্ছে তাঁর মধ্যে ডানা মেলতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে নিজের বাড়িতেই 'গুডউইল ফ্র্যাটারনিটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। একেশ্বরবাদী এই ধর্মসভার প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দেবেন্দ্রনাথের একেশ্বরপন্থী বেদান্তবাদী ধর্মতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে যোগদান করেন কেশবচন্দ্র।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি কেশবের অনুরাগ এবং একনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে স্বল্পকাল পরেই মহর্ষি তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মধর্মের আচার্য মনোনীত করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কেশবচন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করে তোলেন, তাঁর উদ্যোগে সারা ভারতে মোট ৫৪টি ব্রাহ্ম সমাজের শাখা গড়ে ওঠে।

কেশবচন্দ্রের এই ব্যাপ্ত কর্মকান্ড সমসাময়িকদের মধ্যে ঈর্ষার সূচনা করে। অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রের আচার্য পদে নিযুক্তি গোঁড়া হিন্দু সমাজের উষ্মার কারণ হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্রের উপবীত ধারণ, মূর্তি পূজা, জাতিভেদ-প্রথার বিরোধিতা, অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থন, খ্রিস্টীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য এই আগুনে ঘি ঢালে। উপনিষদের ভাবধারায় লালিত দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এসব কিছু মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। ফলশ্রুতি, দুই পুরোধা পুরুষের মতান্তরে আদি ব্রাহ্মসমাজে ফাটল ধরে। অতঃপর কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১৮৬৮ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

সুসাংবাদিক কেশবচন্দ্র গোঁড়া ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীল মনোভাবকে কটাক্ষ করে পাক্ষিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ সম্পাদকীয় কলাম লিখতে শুরু করেন। ১৮৭১ সাল নাগাদ এটি দৈনিকে পরিণত হয়। অপরদিকে ১৮৬৩ নাগাদ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও মেয়েদের অবস্থার সার্বিক উন্নতির জন্য 'বামাবোধিনী সভা' ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। ১৮৭০ সাল নাগাদ কেশবচন্দ্র সাপ্তাহিক হিসাবে 'সুলভ সমাচার' নামক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন, যার মূল্য ছিল এক টাকা। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় সর্বাধিক বিক্রিত পত্রিকা হয়ে ওঠে 'সুলভ সমাচার'।

পাশ্চাত্য-দর্শন ও চেতনার প্রতি আকৃষ্ট কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সালে বিলাতে পাড়ি দেন। বিদেশের মাটিতে তিনি সুবক্তা হিসাবে প্রভূত স্বীকৃতি পান এবং দেশে ফিরে তাঁর সংস্কারকর্ম আরো গতিশীল হয়। ১৮৭০ সালে 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই অ্যাসোসিয়েশন ভোগবিলাস ও পানভোজনে মিতাচার, নারীর বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মাতৃভাষায় গণশিক্ষা, সুলভে পাঠসামগ্রী সরবরাহের মতো বেশ কিছু প্রগতিশীল কর্মসূচী নিয়েছিল। তাঁর উদ্যোগে শহর কলকাতার বুকে সেদিন গড়ে উঠেছিল মদ্যপান-বিরোধী সংঘ, বালিকা বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, পেশাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার জন্য শিল্প বিদ্যালয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর নিজস্ব

দায়বদ্ধতা ছিল লক্ষণীয়। এজন্য তাঁর বসতবাটী 'কমলকুটির' প্রাঙ্গণে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয় 'নেটিভ লেডিজ নরমাল এন্ড এডাল্ট স্কুল'। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে যা অধুনা বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন নামাঙ্কিত হয়।

১৮৭৫-৮৪ এই সময়পর্বে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে কেশবচন্দ্র সেনের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেশবচন্দ্রই তাঁর কলম ও বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কাছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তুলে ধরেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কমল কুটিরে ১৮৭৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সমাধিস্থ পরমহংসদেবের প্রথম চিত্রটি তোলা হয়। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবেই ব্রাহ্ম সমাজে যোগাভ্যাস, বৈরাগ্য, মাতৃ আরাধনার মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব পেতে থাকে।

যদিও এরই মধ্যে কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহকে কেন্দ্র করে ১৮৭৮ সালে কলকাতা শহর এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়। 'অটো-বায়োগ্রাফি অফ এন ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস' নামক মহারানী সুনীতি দেবীর আত্মজীবনীতে পাওয়া তথ্য অনুসারে ব্রাহ্ম ভাবধারা অস্বীকার করে কেশব সেনের কন্যার হিন্দু রীতিতে বিবাহ-সংক্রান্ত ঘটনা কেশব সেনের জীবনের একটি ব্যর্থতা এবং দ্বিচারিতার পর্ব হিসেবে প্রকাশ পায়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগ করে শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসুরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গড়ে তোলেন। ১৮৮১ সাল নাগাদ কেশব সেন 'নববিধান সমাজ' গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম সব ধর্মের সারাংশ নিয়ে এক সর্বধর্মসমন্বয়ী ধর্মীয় সংগঠনের আদর্শকে তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে নববিধান জনপ্রিয় হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় ইতিহাস কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মধর্ম সংগঠক হিসাবে যতখানি জায়গা দেয়, সমাজ সংস্কারক হিসেবে কি ঠিক ততখানি গ্রহণ করেনি! রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার কার্যগুলি সম্বন্ধে আমরা যতজন অবগত কেশবচন্দ্রের সম্পর্কে সেই প্রচার বা গ্রহণযোগ্যতা কখনই গড়ে উঠেনি। বস্তুতঃ তাঁর চরিত্রের দ্রুত বিবর্তন, ব্যবহারিক জীবনে পরস্পর বিরোধী কাজকর্ম এবং আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানীয়দের সাথে বারংবার মতবিরোধ তাঁকে এই সম্মান লাভ থেকে বঞ্চিত করেছে।

ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে থাকা 'নব দেবালয়' কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত সমাধিস্থল। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তাঁর দেহাবসান ঘটলে এখানেই তাঁর চিতাভস্ম সমাধিস্থ করা হয়। কন্যা সুনীতিদেবী সহ পরিবারের অনেকেরই চিতাভস্ম এই সমাধিস্থলে রয়েছে। সাংবাদিক, সুপন্ডিত, সংগঠক, সমাজ-সংস্কারক, বাগ্মী এই মানুষটি আজ বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছেন। অথচ একসময় শুধু দেশ নয়, বিদেশের মাটিতেও তিনি বাঙালির পাণ্ডিত্যের সুঘ্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন। 'নব দেবালয়' তাই উনিশ শতকের এই অগ্নিপুরুষসহ একখণ্ড ইতিহাসকে বুকে নিয়েই যেন আজও জেগে রয়েছে নীরবে।

ছবি— প্রিয়া সরদার ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

JAGANNATHA CULT

Dr. Parnasabari Bhattacharyya

The Jagannatha cult has been originated in Orissa. This cult is related to the ancient tribal and folk culture and tradition in India, as the deity of Sabara tribe. Jagannatha has later been incorporated in the Hindu pantheon.It also has a Epico-Puranic link as being associated with Krishna's life.

The word " Jagannatha" means "the Lord of universe." It is believed that Jagannatha is an incarnation of Vishnu.He is a part of the "Triad" along with his brother Balabhadra and sister Subhadra. Bhagavatism flourished in Orissa in 5th c.CE, when the important tribal deities were equated with Vasudeva and Sankarshana under the new nomenclature of Krishna and Balarama respectively. The tribal, later sanskritized goddess Ekanamsha was identified with Subhadra in this triad. In the Brihatsamhita of Varahamihira, instructions had been given for making the image of these three deities conjointly.

The gradual absorption of heterogeneous attributes by Jagannatha had a great effect on Medieval Vaishnavism of Orissa. Puri is the epicentre of this faith . It's unique tradition includes 'Ratha Yatra ', a grand procession with the wooden images of Jagannatha, Balabhadra and Subhadra along with multifarious rituals, gained global recognition.

Lord Jagannatha is also considered as the supreme cosmic principle of the universe.

ছবি— প্রকৃতি দাস ● সহকারী প্রফেসর ● ভূগোল বিভাগ

জীবনের জলছবি

স্নেহা বসাক
চতুর্থ সেমিস্টার ● ইতিহাস অনার্স

সাবধান! প্রথমেই বলে রাখি, এ এক বিচ্ছেদের গল্প। ওই দেখুন...মনটা খারাপ হয়ে গেল? আচ্ছা, যদি বলি... এ এক অন্তহীন অপেক্ষার গল্প? কি হল, গুলিয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা বিচ্ছেদ আর অপেক্ষার মধ্যে কি খুব বেশি পার্থক্য আছে? আবার আমরা জানি, ভালোবাসার আরেক নাম অপেক্ষা। তাহলে অঙ্কের সূত্র মেনে L.H.S = R.H.S করলে দাঁড়াচ্ছে, ভালোবাসা = বিচ্ছেদ। এই রে, চটে গেলেন নাকি মশাই? আহা, দাঁড়ান দাঁড়ান.... রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অন্তহীন বিচ্ছেদের মধ্যেই চিরন্তন মিলনের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। আসুন, আজ সেরকমই একটা গল্প বলব আপনাদের। গল্পটা ভালোবাসার নাকি দুঃখের, মিলনের নাকি বিচ্ছেদের সেটা না হয় আপনারাই ঠিক করে নেবেন।

সাল, ২০১৫

রিনির বাড়ির উল্টোদিকে নতুন ভাড়া এসেছে ঋজু। ঋজু রিনির থেকে বছর দুয়েকের বড়ো। ঋজুর বাবার সবে ট্রান্সফার হয়েছে কোলকাতায়। তাই বাবা-মা আর ও এসে উঠেছে সুকিয়া স্ট্রিটের যতীন ধর লেনের এই বাড়িটায়।

রিনির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এক সপ্তাহ পর টেস্ট। মা যেন আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছে। সকাল থেকে রিনির সারাদিনের রুটিন বাঁধা। একফোঁটা এদিক থেকে ওদিক হলেই মা যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে। রিনির একেবারে পাগল পাগল দশা। বাবা যত বলছে — "আরে, মেয়েটার ওপর অত চাপ দিও না, ওকে নিজের মতো থাকতে দাও। ও ঠিক ভালো রেজাল্ট করবে।" কে শোনে কার কথা! এরকমই একদিন বিকেলে রিনি রচনা মুখস্থ করছিল, হঠাৎ চিলেকোঠার ঘর থেকে কাঁচ ভাঙার শব্দ এলো। সবাই মিলে দেখতে গেল, দেখল কিছু ছেলে গলির মাথায় ক্রিকেট খেলছিল। তাদের মধ্যে একটা ছেলে, নাম ঋজু, ছয় মেরেছে এবং দৈবক্রমে সেই বলটা গিয়ে লেগেছে রিনিদের চিলেকোঠার জানলায়। সেই প্রথম ঋজু দেখল মেয়েটাকে। হালকা গোলাপি ফ্রক পরে আছে, চুলগুলো এলোমেলো ভাবে হাওয়ার সাথে সাথে উড়ছে, গায়ের রঙ শ্যামলা, পাপড়ির মত ঠোঁটদুটো ওকে দেখে মিটি-মিটি হাসছে। বোঝাই যাচ্ছে, কাঁচ ভাঙায় সে বেশ খুশিই হয়েছে।

টেস্ট পরীক্ষার প্রথম দিন, রিনি বাবা মা কে টাটা করে ঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোল। স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে একটা কাগজের বল ওর গায়ে লেগে পড়ে গেল। কেউ ওটা ছুঁড়ে দিয়েই পালিয়েছে। রিনি খুলে দেখল লেখা আছে—

"শুনেছি কাঁচ ভাঙা নাকি অলক্ষণ, তাও আবার পরীক্ষার আগে। দেখিস বাবা ডোবাসনা যেন। পরীক্ষা খারাপ হলে কিন্তু তোর মা তোকে আর ও বাড়িতে ঠাঁই দেবে না। Good luck"

টং করে মাথাটা গরম হয়ে গেল রিনির। কাগজটা কে ছুঁড়েছে রিনি জানে। অমন কোঁকড়া চুল এ পাড়ায় আর কারোর নেই। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মোড়ের মাথায় দাঁড়াল রিনি। সেখানে যথা নিয়মে ক্রিকেট খেলা চলছিল। রিনি দেখতে পেল ঋজু ব্যাট হাতে নিয়েছে। এমন সময় চোখে চোখ পড়তে রিনি ইশারা করে ডাকল ঋজুকে। ঋজু বিরক্ত হয়ে খেলা ছেড়ে এগিয়ে গেল রিনির দিকে।

ঋজু — কি হয়েছে? দেখছিস না আমি খেলছি?

রিনি — দেখছি তো।

তাহলে ডাকলি কেন?

রিনি সকালের সেই কাগজটা বের করে ঋজুকে দেখাল, এটা কি?

ঋজু — আমি কি করে জানবো। আজব তো!

রিনি — তুমি কি ভেবেছ? আমি তোমাকে দেখিনি? আমি জানি এটা তুমিই ছুঁড়েছো।

ঋজু — আগে বল পরীক্ষা কেমন হল?

রিনি — ভালো।

ঋজু — কি বলিস! তাহলে তো দেখছি কাঁচ ভাঙাটা অলক্ষণের বদলে সুলক্ষণ হয়ে গেল। তার মানে, এবার তো তোর Board-এর আগেও আমায় তোদের বাড়ির আরেকটা কাঁচ ভাঙতে হয়। তাই তো?

এইবার হেসে ফেলল রিনি। কি মিষ্টি লাগে রিনিকে হাসলে, ঋজু দেখল। ঋজু যেন ঝর্ণার ঝংকার শুনতে পেল রিনির হাসিতে। রিনি যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে বলল— "একদিন এসো আমাদের বাড়ি। আর আরেকটা কথা, আমার মা কিন্তু অতটাও খারাপ না।"

ভালো লাগায় সেদিন সারারাত ঘুম এল না ঋজুর। পরেরদিন মাকে ওর কাঁচ ভাঙার কথাটা বলল। মালিনী দেবী ছেলেকে কিছুক্ষণ বকলেন, তারপর ভাবলেন প্রতিবেশীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত। তাই সেদিনই ছেলেকে নিয়ে একটু মিষ্টি কিনে রিনিদের বাড়িতে এলেন।

সাল, ২০১৯

রিনি আর ঋজু দুজনেই এখন কলেজে পড়ে। ঋজুটা যেন আর বড়ো হল না। রিনির মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক দুই পরীক্ষার আগেই সে একটা একটা করে জানলার কাঁচ ভেঙেছে। এখন অবশ্য দুই পরিবারে খুব মিল। রিনির বাবা-মা ঋজুকে নিজের ছেলের মতই দেখেন। রিনিকেও জেঠু-জেঠিমা (ঋজুর বাবা-মা) খুব ভালোবাসেন। ঋজু আর রিনির সম্পর্কের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক —

রিনি — এই ঋজু, দাঁড়া। কোথায় যাচ্ছিস?

ঋজু — এই শালা! সব সময় তোকে পিছনে ডাকতেই হবে বল? একটা শুভ কাজে যাচ্ছি....

রিনি — শুভ কাজ? বটে! তা কি শুভ কাজ শুনি।

ঋজু — উফ্ বাবা! এতো দিন পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। সায়নী পটেছে। লেকের ধারে ডেকেছে আজ। ভাবছি, আজকেই প্রপোজটা সেরে ফেলি। কি বলিস?

রিনি — তুই আর শুধরালি না বল? একটাও তো টিকল না। তাও তোর মনে হয় না যে এবার একটু ভাল করে পড়াশোনা করি?

ঋজু — এতো ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না তো। প্রেম তো করনি চাঁদু, নেশাটা বুঝবে কি করে?

রিনি — দরকার নেই ওরম নেশায় আমার। আর তুই তো প্রেমের নেশার পাশাপাশি অন্য নেশাও ধরেছিস। জেঠিমা কে বলব যে তুই বন্ধুদের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট টানিস?

ঋজু — ওইটাই তো পারিস তুই। নালিশ আর নালিশ। যাঃ যাঃ দূর হ এখান থেকে।

রিনি — তুই যা।

আবার সেমিস্টারের রেজাল্টের দিন—

ঋজু — এই রিনি, শোন না.... মা কে একটু ম্যানেজ করে দে না।

রিনি — তুই এইবারও ধেড়িয়েছিস?

ঋজু — হ্যাঁ রে মানে..... supply আসেনি, তবে একেবারে গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। মা হেব্বি চটে আছে। একটু আয় না।

রিনি — কেন রে? এইবেলা তোর সায়নী কোথায় গেল?

ঋজু — প্লিজ ভাই। তুই সেদিন বলছিলি না তোর একটা বই কেনার খুব ইচ্ছা, কিন্তু সবে বইমেলা গেল তাই মা কিনতে দিচ্ছে না..... ওইটা আমি তোকে কিনে দেব। তুই এইবারের মত আমায় বাঁচিয়ে দে...

রিনি — এসব ঘুষ দেওয়ার থেকে এবার তো একটু ভালো করে পড়াশোনাটা করতে পারিস বল।

ঋজু — সামনের সেম-এ পাক্কা পড়বো। ফাটিয়ে দেবো, তুই দেখিস। এখন চল।

এইভাবে চলতে চলতে চারটে বছর কেটে গেল।

সাল, ২০২৩

রিনি আর ঋজু দুজনেই এখন IT Sector-এ কাজ করে। ইতিমধ্যে ঋজু অনেক মেয়েদের সাথে মেলামেশা করেছে কিন্তু এখন যেন ওর মনে হয়, সত্যি... রিনির মত আর কেউ নেই। কই আর কোনো মেয়ে তো ওর শরীর-স্বাস্থ্যের এত খেয়াল রাখে না, আর কোনো মেয়ে তো ওর দোষ নিজের ঘাড়ে নেয় না, আর কেউ তো ওর এমন অযথা আবদারগুলো মেটায় না। ওরও তো কোনো মেয়ের কাছে নিজেকে এতটা মুক্ত মনে হয় না। সবাই যেন চারপাশে একটা মেকি হাসি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একমাত্র রিনির কাছেই ও প্রাণ খুলে কাঁদতে পারে।

রিনির হঠাৎ ব্যাঙ্গালোর থেকে একটা খুব ভালো কাজের অফার এসেছে। সবাই খুব খুশি। কিন্তু রিনির মন ভালো নেই। ঋজু এই ব্যাপারে কিছুই জানত না। আজকে অফিস থেকে ফিরে এসে মা'র মুখে শুনল। ঠিক তখনই ও খেয়াল করল বুকের বাঁ পাশটা কেমন যেন চিনচিন করছে। রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ও খেয়াল করল মাথার বালিশটা যেন অজান্তেই ভিজে যাচ্ছে চোখের জলে। রিনি চলে যাবে? সেই ছোটোবেলার রিনি যাকে ছাড়া ও কিছু বোঝে না, তাকে ছাড়া ঋজু থাকবে কি করে? আসলে, যেমন যে জিনিসগুলো আমরা না চাইতেই পেয়ে যাই তার মূল্য ঠিক বুঝি না, ঠিক তেমন যে মানুষদের আমরা জীবনে না চাইতেই পেয়ে যাই, আমরা তাদের taken for granted ধরে নিই। আর যখন তারা আমাদের জীবন থেকে চলে যায় তখন বুঝতে পারি যে কি অমূল্য সম্পদ আমরা হেলায় হারিয়ে ফেললাম।

মাঝে কদিন ওদের কথা হয়নি, কিছুটা অভিমানে আর কিছুটা পিছুটানের ভয়ে। কাল রিনি চলে যাবে। ওদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই কলেজ স্ট্রিট। রিনি চলে গেছিল সেখানে। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর। হঠাৎ পিছন থেকে একটা ডাক শুনতে পায় রিনি।

— রিনি দাঁড়া।

পিছন ফিরে তাকায় ও। ঋজু এসেছে।

ঋজু — তোদের বাড়ি গেছিলাম। কাকীমা বলল তুই বেরিয়েছিস, কোথায় গেছিস বলে যাসনি। তখনই বুঝেছিলাম, তুই এখানেই এসেছিস।

রিনি — বল কেন খুঁজছিলি?

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঋজু। তারপর বলল —

তুই কাল চলে যাচ্ছিস?

রিনি — হুম।

ঋজু — কেন?

রিনি — কেন মানে? ভালো একটা চাকরি পেয়েছি, তাই.....

ঋজু — তুই থাকতে পারবি ওখানে?

রিনি — কেন পারব না?

ঋজু — পারবি না তুই। আমি জানি তুই পারবি না। এই কলেজ স্ট্রিট, গঙ্গার ঘাট, কফি হাউস, বইমেলা, দুর্গাপূজা ছাড়া থাকতে পারবি তুই? পারবি এই হাতে টানা রিক্সা, ট্রামলাইন, এই পায়রাগুলোকে ছাড়া থাকতে? এই ঘিঞ্জি গলিগুলোকে তুই ভুলতে পারবি না। বিশ্বাস কর, ভিক্টোরিয়ার পরির ডানায় ছোঁয়া বিকেল আর কোথাও নামে না। এই বইপাড়ার নতুন বইয়ের গন্ধ আর কোথাও পাওয়া যায় না। হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে যখন নৌকা বয়ে যায়, সেই কলকল শব্দের মধ্যে যে শান্তি আছে তা আর কোথাও পাবি না তুই। পারবি তুই এই কোলকাতাকে ছাড়া থাকতে? আমায় ছাড়া থাকতে?

শেষ কথাটা বলতে গিয়ে ঋজুর গলাটা যেন একটু কাঁপল।

রিনি — কি বললি?

ঋজু — সত্যি করে বল, পারবি তুই আমায় ছাড়া থাকতে?

রিনি — আমি এতদিন খুব ভেবেছি জানিস। এই কোলকাতা, তুই, মা-বাবা সব আমার পিছুটান। সেই সব কাটিয়ে সত্যিই যেতে পারব কিনা। তারপর

ভাবলাম, হয়তো তোকে ছাড়াই আমি, ভাল না থাকি অন্তত শান্তিতে থাকতে পারব। সেই ছোটবেলা থেকে তোর এই 'আমায় ভালো না বাসা' আমি আর নিতে পারছি না বিশ্বাস কর। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, হয়ত কালকে ঋজু বুঝতে পারবে যে ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু না..... অবহেলা ছাড়া আর কিছুই পাইনি তোর থেকে।

ঋজু — রিনি বিশ্বাস কর। আমি সত্যি বুঝতে পেরেছি যে আমি তোকে কতটা ভালোবাসি। Please তুই যাস না।

রিনি — জীবনটা এতটা সহজ নয় রে। এতদিন আমি তোর জন্য বাবা-মা কে অনেকটা কষ্ট দিয়েছি। ওঁরা যতবার আমায় জিজ্ঞেস করেছে আমি কাউকে ভালোবাসি কিনা, আমি ততবার 'না' বলেছি। ওঁদেরকে সম্বন্ধও দেখতে দিইনি কাজের অজুহাত দিয়ে। ওঁদেরও তো বয়স হচ্ছে বল। আর কতদিন আমি তোর জন্য অপেক্ষা করে যাব? এই চাকরিটা পেয়েছি শুনে মা-বাবা খুব খুশি। সব আত্মীয় স্বজনকে ফোন করে-করে বলেছে। হয়ত অনেক স্বপ্নও দেখেছে। আমি কি করে ওঁদের স্বপ্নগুলোকে আবার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই বল। অনেকটা দেরি হয়ে গেছেরে ঋজু।

ঋজু — তুই সত্যিই চলে যাবি? কাকু-কাকিমার কি হবে?

রিনি — এক-দুই বছরে একটু settle করে নিয়েই মা-বাবাকে ওখানে নিয়ে চলে যাব। ততদিন তুই একটু ওঁদের দেখে রাখতে পারবি না?

একটু হাসল ঋজু। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর যেমন করে মানুষ হাসে। করুণার হাসি। নিজের প্রতি করুণা হচ্ছে ওর।

ঋজু — চা খাবি?

রিনি — চল।

ঋজু — এখানে একটু দাঁড়া।

এই বলে ঋজু বই পাড়ায় ঢুকে গেল। রিনি চায়ের দোকানটায় বসে রইল। একটু পর ঋজু ফিরে এল। হাতে একটা বই — জয় গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন।

ঋজু — মনে আছে তোকে একটা বই দেব বলে প্রমিস করেছিলাম, যা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ দিলাম। এটা ব্যাঙ্গালোর চলে যাবার পর খুলিস।

ঠিক তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ওরা তাড়াতাড়ি দোকানের ছাউনির তলায় চলে এল। নিঃশব্দে দুজন চা খেল। মাটির ভাঁড়ের চা। রিনির একবার কান্না পেল, কিন্তু ঋজুর সামনে কাঁদবে না ও। নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ ঋজু উঠে বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল। রিনি পিছু ডাকল না আর। দেখল অঝোর শ্রাবণের ধারায় ভিজে যাচ্ছে ওর চিরপরিচিত বইপাড়া। চারিদিক বৃষ্টির ঝাপটায় কেমন আবছা হয়ে এল।

সাল, ২০৩৩, ব্যাঙ্গালোর

মাঝে দশটা বছর কেটে গিয়েছে। আজ রিনির ছুটি। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মায়ের ডাকে ঘুমটা ভেঙেছে ওর। পলকে তাকিয়ে নেয় পাশে। রিম্পি ঘুমোচ্ছে। রিম্পি হল রিনির পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। এই কবছর আগেই adopt করেছে ওকে। রিম্পিকে নিয়েই দিন কেটে যায় রিনির। দরজাটা খুলল রিনি। কিছুক্ষণ কথা বলল মায়ের সাথে। মা হঠাৎ বলল আজ নাকি দশ বছর হয়ে গেল ওরা কোলকাতা ছেড়ে এসেছে। মা রান্না করতে চলে গেল। নিজের বইয়ের তাক থেকে বেশ পুরোনো একটা বই বার করল ও। 'জয় গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন।' বইটার প্রথম পাতাটা খুলল। চোখের কোনে একফোঁটা সমুদ্র যেন চিক্‌চিক্ করে উঠল রিনির। সেখানে লেখা আছে —

"আমার ভালোবাসাটা কিন্তু মিথ্যে ছিল না।
— ঋজু"

কি মনে হচ্ছে? এতক্ষণ ধরে একটা বাজে গল্প শোনালাম? আচ্ছা, গল্প যদি জীবনের সাথে না মেলে তাহলে গল্পের সার্থকতা কোথায়? এবার আপনারাই বলুন, এ গল্প মিলনের নাকি বিচ্ছেদের না অপেক্ষার?

একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু

জামিলাতুল ফেরদৌস
অধ্যাপিকা ● বাংলা বিভাগ

এখন আমি শান্তভাবে বুড়িয়ে যেতে চাই।
রূঢ় রৌদ্রে ঝল্‌সে যেতে হবে —
নরম রোদে সেঁকে নিতে চাই স্বপ্নের ডালপালাগুলিকে।

বড় ইচ্ছে জাগে —
আমাদের সম্পর্কগুলি যেন সুস্থিতি পায়!
ভাই - বন্ধু - প্রেমিক, শিক্ষক, প্রতিবেশী —
উঠোনের জল-দাগে আঁকা আলপনার মতো
অদৃশ্য হয়েও যেন সুস্পষ্ট থাকে।
বন্ধুত্বের হাত যেন লোহার শৃঙ্খল হয়ে
বেঁধে না ফেলে!
চোখে যেন স্বপ্নের বদলে
রক্তকণা ঠিক্‌রে না পড়ে!

হিল্লোলিত তরুলতার মত কিশোরীর লাজুক হাত
আবার কখন টিয়া-রঙ উদ্যানে যূথবদ্ধ
হতে পারবে! সম্মতিতে, নির্ভরতায়!
বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, ভরসা কিংবা আকুলতারা
আমাদের মনে শরতের রৌদ্র হয়ে ভেসে বেড়াক।

নেতাজীর প্রতি

শুচিস্মিতা খাঁড়া
সহকারী অধ্যাপিকা ● সংস্কৃত বিভাগ

নেতাজী, তোমার নামেতে বহ্নি
অনির্বাণ শিখা,
নেতাজী, তোমার বুকে বিপ্লব
রক্ত আখরে লিখা।

নেতাজী, তোমার উন্নত শির
সাহস দুর্জয় —
নেতাজী, তোমার দৃপ্ত চরণ
জানে না সে কোনও ভয়।
নেতাজী, তোমার মস্তিষ্কে
ধিষণার ক্ষুরধার
নেতাজী, তোমার বাণীতে শাণিত
ঝকঝকে তলোয়ার।

নেতাজী, তোমার হৃদয়ে সাগর —
দেশপ্রেম অতল —
নেতাজী, তোমার আহ্বানে জাগে
জীবনের কোলাহল।

নেতাজী, তোমার তিতিক্ষা-ত্যাগে
দৃঢ় সন্ন্যাসী মন,
নেতাজী, তোমার ছদ্মবেশেতে
মহানিষ্ক্রমণ।

নেতাজী, তোমার নামেতে মৃত্যু
দেখে মরণের ভয় —
মর্ত্যমানব মৃত্যুরে জিনি
তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

নেতাজী, তোমার পদতলে রাখি
আনত শির আমার,
নেতাজী, তোমার দুর্ভাগা দেশে
ফিরে এসো আরবার।

ছবি— দেবীশা নন্দী ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

কুমোরটুলির গল্প

অন্তরা গোস্বামী
দ্বিতীয় সেমিস্টার ● ভূগোল

দিনটা ছিল শনিবারের একদিন আগে, মানে বৃহস্পতিবার। পরপর তিন চারটে ক্লাস করার পর আমি আর আমার বান্ধবী অরিত্রা দুজনেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার একমাত্র কারণ আমাদের স্নাতক স্তরের পড়াশুনা। ভূগোল বিভাগের ছাত্রী আমরা। এখন যদি যমরাজ স্বয়ং নিজে এসে বলে যে আমার সাথে চলো, তবে তাকেও বলতে হবে, আপনি দাঁড়ান প্র্যাক্টিকালটা সই করিয়ে নিই, তারপর যাচ্ছি। যাইহোক।

ও! আমার নামটাতো বলতেই ভুলে গেলাম। আমার নাম অন্তরা। তারপর দুজন মিলে আলোচনায় বসলাম, কি করা যায়। আর তো পারছি না, একঘেয়ে লাগছে, মন ভালো নেই, কোথাও একটা যেতে ইচ্ছা করছে। আর যদি কোথাও যাই তাহলে এমন জায়গায় যাবো যেখানে প্রচুর ছবি তোলা যাবে। কারণ আমরা দুজনেই ছোটোখাটো ফটোগ্রাফার। ফেসবুক, ইন্সটায় আমাদের তোলা ছবির বেশ চাহিদা আছে। আর কাজটাও খুব ভালোবাসি।

ঠিক হল কুমোরটুলি যাবো। এখন জুলাই মাস, ঠাকুর গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছবি তোলার আদর্শ সময়। যথারীতি শনিবার দিন ক্লাস বাদ দিয়ে চললাম কুমোরটুলি। দমদম পৌঁছে, মেট্রো ধরে সোজা শোভাবাজার সুতানুটি। জায়গাটায় পৌঁছাতেই একটা পুজো পুজো গন্ধ। তারই সাথে দূর থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা হাল্কা সুর ভেসে আসছিল। আর আমাদের মতো সংস্কৃতি ও সঙ্গীত-প্রেমীদের কাছে এমন একটা পরিবেশ শহরের ওই চারতলা ইমারতগুলোর থেকে অনেক বেশি সুন্দর ও শান্তির।

একটা গলি দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। প্রথম দিকের বাড়িগুলো ঢুকতে দিল না। কারণ, অনেক সময়ই ছবি তুলতে গিয়ে ধাক্কা লেগে মূর্তির ক্ষতি হয়। বাইরে থেকেই ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। তারপর আর একটু এগোতেই একটা বাড়ির ভেতরে এক বৃদ্ধ মন দিয়ে নিজের মেয়েদেরকে গড়ছে। "দাদু ভিতরে আসব, মায়ের ছবি তুলব কটা" — একথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন "হ্যাঁ হ্যাঁ এসো"। ভেতরে যখন এক পা সবে মাত্র ঢুকেছি, ঠিক বলে বোঝাতে পারব না, একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করলাম। তার ওপর মাটির কাজ, পুরো ঠান্ডা ঘর। সারি সারি দশভুজা আমার দুপাশ দিয়ে। সুন্দর মিষ্টিমুখ, টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, সুগঠিত ওষ্ঠাধর, ভিজে মাটির সিক্ত ভাব, আর বাইরের রোদের আলো মূর্তির একপাশে এসে পড়ছিলো। মূর্তি থেকে যেন একটা তেজ ঠিকরে বেরোচ্ছিলো।

আমরা ছবি তুলতে লাগলাম। একপাশে অনেক গণুদাদারা বসে। তারপর সেখান থেকে আর একটা বাড়ি। সেখানেও মা সাজছে। এরপর রাস্তায় হাঁটছি, দেখি চড়া রোদে মায়ের মুখ লাইন দিয়ে শুকানো হচ্ছে উল্টো করে। ছবি তোলার দারুণ স্টাইল পেলাম। এগোতে এগোতেই একটা ঘর চোখে পড়ল, এক ভদ্রলোক ছোট্ট ছোট্ট দুর্গা দিয়ে ঘরটা ভরিয়ে ফেলেছেন। ব্যাস, আমাদের কাজ শুরু। ভদ্রলোকের সাথে বেশ খানিকক্ষণ গল্প করলাম। তিনি যে ফটোগ্রাফির বেশ কিছু বোঝেন সেটা তার কথায় বুঝতে পারলাম। আমাদের তোলা ছবিগুলো দেখলেন। তার বেশ পছন্দ হয়েছিল। তারপাশেই একটা দোকানে শুধু শাড়ি আর শাড়ি, সবই ঠাকুরের।

যেতে যেতে পথে তিন চারটে দশকর্মার দোকানও পড়ল। একটা দোকানে শুধু মায়ের মুখ বিক্রি হচ্ছিল। ধান, কাঁচ-এর মতোন জিনিস দিয়ে তৈরী হস্তশিল্প, যেগুলো দিয়ে ঘর সাজানো হয়। তারপর একটা ছোট্ট গলি, সেখানে অনেকজন বৃদ্ধ মিলে ছাঁচে মাটি দিয়ে

গয়না তৈরী করছে। হঠাৎ দেখি একটা বাড়ির দরজা দিয়ে মা মনসা তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। তারপর আর একটা বাড়িতে ঢুকে দেখি সবে বিচুলির কাঠামো, গায়ে মাটি পড়েনি তখনও। সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটছি আবার। কিছুদূর যেতেই দুটো ঘর ঠাকুরে ভর্তি। ভেতরে ঢুকতেই আবার সেই একই রকম অনুভূতি। আর এখানকার ঠাকুরগুলো বেশ উঁচুতে ছিল। মনে হচ্ছিল আমার চারদিকে অনেক সৈন্য দাঁড়িয়ে, যদি কেউ যুদ্ধ করতে আসে তবে আমিই জিতব। শরীরে একটা অদ্ভুত শক্তি পাচ্ছিলাম। সেখান থেকেও কাজ শেষ করে বেরোলাম। সেদিন অত রোদে গৌরীকে দেখতে গিয়ে আমরা দুজনেই শ্যামা হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

হাতে তখনও অনেক সময়। পৌঁছালাম গঙ্গার ঘাটে, নিজেদের তোলা ছবিগুলো দেখলাম। আমাদের দুজনের বাড়ি থেকেই দুজনের জন্য অনেকটা করে টিফিন দেওয়া হয়েছিল। সেটা অতি কষ্টে আত্মসাৎ করলাম। কারণ দুজনেই খুব কম খাওয়াদাওয়া করি। রেস্ট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। দেখি রাস্তার উপর একটা আইসক্রিম গাড়ি। নিজে একটা আর অরিত্রাকে একটা কিনে দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। সেদিন ভীষণ গরম, তারপর শরীরটা কারুর ভালো নেই।

তারমধ্যেই অরিত্রা বলল ভূতনাথ মন্দিরের কথা। যেই বলা সেই কাজ। কিন্তু কোনো টোটো, অটো বা বাস নেই সেই রাস্তায়, অগত্যা হাঁটিহাঁটি পা পা। অনেকক্ষণ হাঁটার পর, ভীড় ঠেলে পৌঁছলাম মন্দির চত্বরে। রাস্তার ধারে বিপত্তারিণীর পুজো হচ্ছে। মন্দিরের কাছে পৌঁছাতেই দুজনে মিলে একান্ন টাকার ডালি কিনে পুজো সারলাম। আর ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা যেন রেজাল্ট ভালো হয়। সেখান থেকে ফেরার পথে গঙ্গার ঘাটে নামলাম মায়ের ঘরের পুজোর জন্য গঙ্গাজল নিতে। এই জিনিসটা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিলে আর বলতে পারবে না যে আমি অকম্মের ঢেঁকি।

কিন্তু এর দুদিন পরের ঘটনার কথাটা উল্লেখ না করলে গল্পটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অরিত্রাকেও ওর মায়ের জন্য একটু গঙ্গার জল দিয়েছিলাম। কিন্তু ও বাড়ি গিয়ে বলতে ভুলে যায় এবং আন্টি এমনি জল ভেবে চা বানিয়ে খেয়ে ফেলে। আর জলটা এতই পরিষ্কার ছিল যে গঙ্গার জল বোঝা যায়নি। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

অতঃপর বাড়ির পথে। ফেরার পথে দেখি একটা ছোট্ট দুর্গা রোদে শুকোচ্ছে। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের ছিটেফোঁটা রোদ এসে পড়েছে মায়ের মাথার মুকুট দিয়ে হাতগুলোয়। অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য। তারপর ছবি তোলা শেষ করে চললাম মেট্রোর উদ্দেশ্যে। ফেরার সময় মহাত্মা গান্ধী রোড হয়ে, বাসে করে মানিকতলা, তারপর অটো করে রাজাবাজার হয়ে কলেজের সামনে দিয়েই শিয়ালদহ স্টেশন। এই ছিল সেদিনকার যাত্রাপথ। তবে সারাদিন এত ধকলের পরও ফেরার পথে মাথার মধ্যে শুধুমাত্র দৃশ্যগুলো তাদের স্মৃতি রচনা করছিল, আর সেই রচনারই একটুখানি অংশ তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম।

স্রোতস্বিনী

সানন্দা চৌধুরী
পঞ্চম সেমিস্টার ● বাংলা সাম্মাণিক

পরপর তিনবার টোকা পড়ল দরজায়। ঘরে অন্ধকারের স্তূপ। শোকাচ্ছন্ন মোহনা সোফায় বসে। প্রথমে শুনতেই পায় না। শেষবারের শব্দে চমকে ওঠে। শব্দটা চেনা তার।

দিনটা রবিবার। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি। আর পাঁচটা দিনের মতোই সেদিন শয্যা ত্যাগ করে মোহনা। একইভাবে কফির কাপ হাতে বারান্দায় দাঁড়ায়।

দক্ষিণ কলকাতার এক আবাসনে চাকরিসূত্রে একাই থাকে মোহনা। আদি বাড়ি বর্ধমান। সেখানে মা, বাবা, বোন থাকে। স্বচ্ছল ও সুখী পরিবার। তবে মোহনা কর্মরতা অর্থের জন্য নয়। স্বাধীনতা উপভোগের জন্য। ছুটি পেলেই বাড়ি যায়। কলকাতায় দেখতে দেখতে দুবছর কাটিয়ে দিয়েছে মোহনা। এরমধ্যেই তার জীবনে এসেছ স্রোত। ছেলেটিকে বড্ড ভালোবাসে মোহনা। নিজের সবটুকু দিয়ে পূর্ণ করে ভালোবাসে। মোহনার মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা যেদিন স্রোত তাকে presentation-টাতে সাহায্য করে। তারপর সে নিজেই সেরা presentation হয়ে যায় মোহনার জীবনে। হেসে ফেলে মোহনা। হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। আর তারপর.....

২০ মিনিটের মধ্যে রুবি হাসপাতালে পৌঁছয় সে। প্রথমেই দেখতে পায় অনাথ স্রোতের একমাত্র নিজের মাসি আর তার বন্ধু শুভময়কে। তারপর ছোটে ICU-র দিকে। স্রোত শুয়ে কিছু দূরের শয্যাটায়। পাশের যন্ত্রটা জানান দিচ্ছে স্পন্দন ম্লান হয়ে আসছে। সারা মাথায় ব্যান্ডেজ। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মোহনা। ফিরে এসে মাসির পাশে বসে। ভাবতে পারে না আর কিছু, কিন্তু বিধাতা যে ভাবিয়েই ছাড়ে। কিছু পরে ডাক্তার জানায় সব শেষ। রোড accident-এ; রাতে মোহনার আবাসন থেকে ফেরার সময় express-এর রাস্তা ধরে স্রোতের গাড়ি। আর নিয়ন্ত্রণ হারানো লরির সাথেই.....

তারপর থেকে পাথর হয়ে সবটা করেছে মোহনা। পুলিশের কাছে গেছে, দাহ কাজ সম্পন্ন করেছে, মাসিকে সামলে বাড়ি ফিরেছে সবে, এখনও আত্মস্থ করতে পারিনি। এখনও আশা করছে স্রোত আসবে। তাকে যে আসতেই হবে।

এরই মধ্যে দরজায় টোকা। কিছু না ভেবেই দরজা খুলে দেয় মোহনা। আলো জ্বালেনি আজ সে। তবুও কোথা থেকে আসা এক আলোয় সে দেখতে পায় স্রোতের সেই অবয়ব। হ্যাঁ তার স্রোত। মোহনা ভুলে যাচ্ছে যে সে নিজে স্রোতের দাহকার্য দেখেছে, মোহনা ভুলে যাচ্ছে পৃথিবীর সব সত্য। তার এখন একটাই সত্য। স্রোত। তারপর এক মহাসুখ নেমে আসে মোহনার জীবনে।

.....পরদিন সকালে মোহনার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মোহনার কাজের দিদি অনেকবার bell বাজিয়ে সাড়া না পেয়ে দরজা ভাঙায়। আর ভেতরে এসে দেখে চির শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন মোহনা। এক প্রশান্তির ছাপ তার মুখে স্পষ্ট। পুলিশ তার মৃত্যুর কারণ খুঁজে পায়নি।

স্রোত আসেনি মোহনার কাছে, মোহনা স্রোতে মিলেমিশে গেছে। তাদের প্রেম স্বর্গীয় হয়েছে। তাদের মিলনে হয়তো বা সাক্ষী থেকেছেন দেবদেবীরা।

কখনো মোহনায় বেড়াতে গেলে দেখবেন মোহনা শান্ত, স্থির, ধ্যানমগ্না... স্রোত সেখানে বেমানান। হয়তো বা এই বেমানান ভালোবাসার কারণেই তাদের প্রেম স্বর্গীয়।

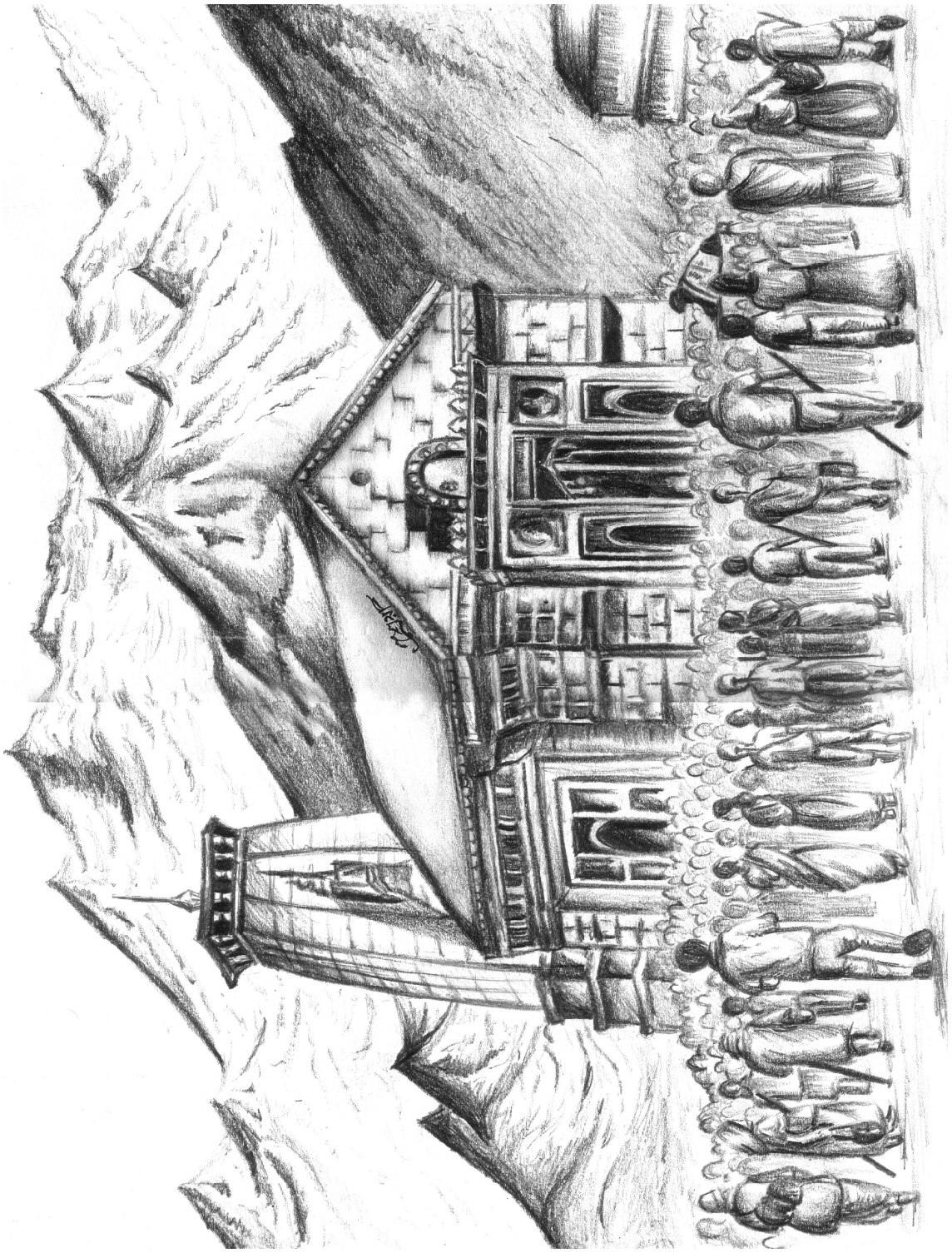

ছবি— শ্রেয়া দাস ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে .....

আণবিকা গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলা সাম্মাণিক (১৯৮৫)

তখনও বিদ্যাপতি সেতু তৈরি হয়নি। শিয়ালদায় লোকাল ট্রেন থেকে নেমে যে রাস্তাটা শহরতলির স্কুলের মাধ্যমিক পাশ আমরা তিন বন্ধু প্রথম চিনেছিলাম সেটা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড। অবশ্য সবচেয়ে বেশিবার আমরা জগৎ সিনেমার পাশের রাস্তা সূর্য সেন স্ট্রীটে ঘুরে বেড়িয়েছি — বিনা উদ্দেশ্যে — ওখানেই আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা ছিল --- ওখানেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলামও বোধহয়! প্যাচপেচে কাদা বাঁচিয়ে সরস্বতী প্রেসের পাশ দিয়ে আমরা ফুটপাত ধরে কলেজে আসতাম। সরস্বতী প্রেসের কর্মীরা তখন কোনো কারণে রাস্তায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান আন্দোলন করছিলেন। আমাদের যাতায়াতের পথে প্রতিদিন কাগজে লেখা অবস্থানের দিনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে কোনো একদিন তাঁবু উঠে গেল — পরে সরস্বতী প্রেসে ছাপানো রবীন্দ্র রচনাবলির গ্রাহকও হয়ে ছিলাম। সেটা ছিল আগষ্ট মাস। ঘোর বর্ষা। ছাতা মাথায় দিয়ে কলেজে কলেজে ঘুরে ফর্ম সংগ্রহ করছিলাম। আমার দুই বন্ধুর সরাসরি ভিক্টোরিয়া কলেজেই ভর্তি হবার সংকল্প ছিল — তারা ভর্তি হয়েও গেল। আমার একটু দেরি হল। সেটা ছিল ৮ আগষ্ট আমার ভর্তি হবার দিন। অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে নতুন পরিচয় নিয়ে শহর থেকে দিন শেষে শহরতলিতে ফিলে এলাম --- 'কলেজ পড়ুয়া'। তখন অনায়াসে আরও দুবছর স্কুলে পড়া যেত। কিন্তু কলকাতা আর কলেজ --- মনের কর্ণকুহরে কোকিলের ডাক শুনিয়ে যেত রোজ ভোর হলে। পরে দু'বছর পরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার ফর্ম ফিলাপ করতে এলে অফিসের নীরাদি তখনকার দশ নম্বর ঘরে (এখন সে ঘর নেই, সেখানেই দোতলায় হয়েছে সুনীতি সভাঘর)। আমাদের প্রথমেই বলে দিলেন "কলেজের নাম লিখবে — ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশান কলেজ। ভিক্টোরিয়া কলেজ লিখবে না, ঐ নামে দার্জিলিং-এ কলেজ আছে।" জানলাম যে, কলেজ বাড়িটা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম স্থপতি দার্শনিক শ্রী কেশবচন্দ্র সেনের বাসগৃহ ছিল --- যেখানে কেশব মেমোরিয়াল হল নামের একটা ব্যালকনি সম্বলিত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অ্যাসেম্বলি হল আছে। তার বাঁদিকে দেবালয় — সে সময় ঢুকতে সাহস করতাম না। হলের ডানদিকে মেয়েদের হস্টেল — সবেতেই স্কুল ও কলেজের যৌথ অধিকার। মাঠটা অবারিত ছিল। পরে স্কুল-কলেজের ভাগাভাগি পাঁচিল উঠেছে। হলের ওপরে ছোট ছোট সেমিনার রুম আর চমৎকার লাইব্রেরি। আমাাদের আসা-যাওয়ার পথেই একদিন তৈরি হল রাস্তার ওপর রাস্তা, শিয়ালদা ফ্লাইওভার, বিদ্যাপতি সেতু।

আমি প্রথম দু-বছর সায়েন্স স্ট্রিমে পড়েছি। একটাই সেকশন ছিল। তাই খুব বড়ো ক্লাস। বাংলা, ইংরেজির ক্লাস হতো কখনো সায়েন্স বিল্ডিংয়ে, কখনো আর্টস বিল্ডিংয়ে। নন্দিনীদির ক্লাস। কিছু একটা লিখতে দিয়েছিলেন text-এর বাইরে। কিছু পারি না পারি সবার আগে খাতা জমা দিতে হবে। নন্দিনীদি খাতাটা পড়লেন — অন্যরা তখন লিখছে, হয়তো দু-একটা খাতা জমা পড়েছে। সেটা ছিল সায়েন্স গ্যালারি, আমি মাঝখানের রোয়ে মাঝামাঝি জায়গায় বসেছিলাম। নন্দিনীদি নিজে ঐ লম্বা ডেস্কের পেছন দিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমার খাতাটা যখন দেখছিলেন তখনই ভুলগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। আমার পাশে এসে খাতাটা নিয়ে আমার কোথায় কেন ভুল হয়েছে বুঝিয়ে বললেন এতো নিচু গলায় — পাশের

মেয়েটি যেন শুনতে না পায়। জানিনা কি কারণে এটা করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমার ভুল ধরাতে আমি যেন অন্যদের কাছে লজ্জিত না হই, সে জন্যই এতো আস্তে দিদি আমাকে পড়া বুঝিয়ে দিলেন। অভিভূত হয়েছিলাম, ভুলতে পারিনি সে কথা আজও — কি চমৎকার শিক্ষা! কিন্তু এমনটা নিজেকে তৈরি করতে পারলাম কই? আমি যখন দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেছি — একদিন শিক্ষকদের স্টাফরুমে আমার গাইডের জন্য অপেক্ষা করছি — নন্দিনীদির সঙ্গে দেখা। দুজনেই খুশি। দিদি তখন গেস্ট লেকচারার। আমার নামটা জিজ্ঞাসা করলেন — ভুলে গেছিলেন। এক ব্যাপারে দুজনেই একমত হলাম --- এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে আমরা ছিলাম ভালো, স্বচ্ছন্দ। দিদি বললেন, এখানকার ওরিয়েন্টেশনটাই আলাদা। ঠিক ওরিয়েন্টেশন শব্দটার তাৎক্ষণিকতার অর্থ ছাপিয়ে সে যে কতো কতো ব্যাপক — তা আজ অনুভব হয়।

ভারতীদির নেতৃত্বে আমরা পুজোর ছুটিতে শারদোৎসব অভিনয় করলাম — 'প্লে রিডিং' ভারতীদির কাছে শেখা; শ্রুতি নাটক তখন আমরা বলতাম না। (এর আগেও এগারো ক্লাসে পড়ার সময় সাহাজাহান নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয় হয়েছিল।) এই নাটকে কতগুলো গান ছিল --- রমাদি গাইবেন রাজা বা সন্ন্যাসীর গান, একটা গান গাইলেন নন্দিনীদি — অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া.... সেই মন্দমধুর হাওয়ায় কোন সাগরের পারে কোন সুদূরের দেশে অকালে চলে গেলেন নন্দিনীদি! স্নিগ্ধাদি হলেন সন্ন্যাসী। ভারতীদি শুধু পরিচালনা করলেন। সেই পুজোর ছুটিতে কি আশ্চর্য শরৎ এসেছিল — রমাদির গাওয়া সেই গান — 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার.....' গানের রেশ শেষ হতে হতেই স্নিগ্ধাদি সেই সুর ধরে নিতেন — গান শেষ হলে আবার সংলাপ। সে সময়ের সেই সোনার থালায় আমাদের নবযৌবনের অকারণ দুঃখের অশ্রু মুক্তোবিন্দুর মতো জমে আছে, থাকবে আরও কতোদিন। তারপর রমাদির সঙ্গেও কয়েকবার দেখা হয়েছে কলেজেই।

সেবার বিনতাদি নেই। প্রাক্তনীদের মিটিংয়ে এসেছেন রমাদি, আমি বললাম ঐ গানটা শুনবো 'এ পরবাসে রবে কে'। গাইলেন রমাদি শেষদিকে সুর কেমন হয়ে যাচ্ছিল। হয়তো বিনতাদিকে মনে পড়ছিল।

আবার ফিরে যাই পুরোনো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে দশ নম্বর ঘরে, স্নিগ্ধাদি পড়াচ্ছেন রাইজিং অব দি মুন। আয়ার ল্যান্ডের ঘরে ঘরে বিপ্লবী — এ আমরা জানি। সিস্টার নিবেদিতাও এদেশে এসে বিপ্লবীদের সহযোদ্ধা হয়েছিলেন। সে সময় খবরের কাগজে পড়েছিলাম ববি স্যান্ডাসের কথা। সাতাশ বছরের আইরিশ বিপ্লবী জেলে বন্দী। সে অনশন করছে — শেষকালে তার অনশনেই মৃত্যু হল। একটা হাসিমুখের ছেলের ছবি — সাদায় কালোয় খুব উজ্জ্বল নয় — তবু তার হাসি মুখ আজও মনে আছে — অনশনে শেষদিকে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্নিগ্ধাদি পড়াচ্ছিলেন লেডি গ্রেগরির দা রাইজিং অব দা মুন। এক 'ভয়ঙ্কর' বিপ্লবী অর এক ছা-পোষা পুলিশ সার্জেন্ট — হঠাৎ চমকে গেছিলেন কমরেড সম্বোধন শুনে। এর আগে একবার সার্জেন্ট ঐ ভিখিরির মতো চারণকবিকে বলেছিলেন আরও দুজন পুলিস কর্মী আছেন আমার সঙ্গে তারা আমার কমরেড। সমগ্র নাটকে এই দুবার এই শব্দ আছে। আর আছে কতোগুলি গান। বন্দরে একটা মস্তো পিপের ওপর পিঠে পিঠ দিয়ে বসেছে এক পুলিস সার্জেন্ট, আর এক আগন্তুক — সে স্মৃতি উসকে দিচ্ছে — তাদের কৈশোরের প্রথম যৌবনের গাওয়া গান — যে গানে তারা শেকল পরা দেশ জননীর মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে। অবশেষে ছদ্মবেশী বিপ্লবীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে পুলিশ সার্জেন্ট। ছাপোষা চাকুরিজীবি একশো পাউন্ড আর একটা পদোন্নতির চকচকে লোভের চাকতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে দেখেন আকাশের উদিত চাঁদকে। জলে বৈঠার শব্দ — সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় বিপ্লবী, দুই সহযোগী পুলিশম্যান এক্স আর বি-কে

অন্ধকার রাতের একমাত্র বাতি লণ্ঠনসহ বিদায় করে দেন। নির্বিঘ্নে পালাতে দেন বিপ্লবীকে যে জন্য, এই রাতে ঘরের বাইরে, তাঁর প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগছে — তাঁরই প্রতীক্ষায়। সহপাঠীদের নজর এড়িয়ে কতোবার চোখ মুছেছি — আর ঝাপ্‌সা চোখে ভেসে উঠেছে ববি স্যানডাসের মুখ! স্নিগ্ধাদির সঙ্গে সেই 'কমরেড' শব্দের চমক, যা ঐ সময় আমাদের কলেজে ক্লাসরুমের ট্যাবু জড়িয়ে স্নিগ্ধ স্মৃতিতে থাকবে চিরদিন। আর একদিন কোন টেক্সট পড়াতে গিয়ে স্নিগ্ধাদি বললেন — রিফ্লেকশন মানে বোঝো তোমরা? — সমস্বরে বলে উঠলাম 'হ্যাঁ ... প্রতিফলন'। স্নিগ্ধাদির স্মিত হাসি উচ্ছ্বসিত হলো — আরে তোমরা তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট — হ্যাঁ ঠিকই, তবে এখানে বোঝাচ্ছে 'ভাবনা'। স্নিগ্ধাদির ক্লাস করতে আমাদের ভালো লাগতো। এতো সুন্দর করে পড়াতেন! চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল ঝকঝক করা যেন দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম বিপ্লবী নির্বিঘ্নে মুক্তির পথে চলে যাচ্ছে — আর ব্যক্তিগত লাভের হিসেবের বাইরে এসে একজন কর্তব্যরত ছা-পোষা পুলিশ সার্জেন্ট তাঁর যৌবনে দেখা দেশমুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। স্নিগ্ধাদি এখনও তেমনটাই আছেন — স্মিত-স্নিগ্ধ।

আমি ডিগ্রিতে স্ট্রিম বদলালাম। বাংলা অনার্সের স্ক্রিনিং টেস্ট হতো — যত সিট ছিল তার চেয়ে চাহিদা বেশি ছিল। পরীক্ষা তো দিলাম। রচনা এসেছিল। বেশ কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করে লিখতে হবে — ভাঁড়ারে যখন কিছু নেই তখন গোঁজামিল ভরসা — লিখলাম 'কারা উপন্যাস'। কী যে লিখলাম! শোভাদি ছিলেন তখন বিভাগীয় প্রধান। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল মন্দিরা দত্তরায়। আর শোভাদি আমার রচনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! কি আর বলবো। অনীতাদি রবীন্দ্র সাহিত্য পড়াতেন। অনীতা গুপ্ত। চমৎকার পড়াতেন। ঘরে বাইরে পড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিলেন, আর এলেন না। নীলাদি পড়াতেন শরৎ উপন্যাস পল্লীসমাজ। সুগায়িকা নীলা মজুমদার। মীরা দি আধুনিক কবিতা। আটবছর আগের একদিন পড়াতে গিয়ে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন — কোনো ছাত্রীর ভাই সে হঠাৎই একদিন আত্মহত্যা করে — বাড়ির লোকেরা কোনো কারণ বুঝতে পারেনি। আমার খুব বানান ভুল হতো — আর মীরাদি বলতেন এর বানানেই সব নম্বর খাবে। ভাগ্যিস বলেছিলেন, এখন আমি যে কতো লোকের বানানে ভুল ধরি! অনেকটাই শুধরে নিয়েছি। ফার্স্ট ইয়ারে বা সেকেন্ড ইয়ারে আমার পক্স হয়েছিল। সেরে গেলে কলেজে এলাম, সারা মুখে দাগ — মীরাদি বললেন এখন সাবধানে থাকবে — খুব পেটের অসুখ হয় আর ঠান্ডা লাগে। কি আশ্চর্য দুদিন বাদেই আমি, যা খুব একটা করতাম না --- একটা আইসক্রিম কিনে খাচ্ছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে, তখন মীরাদি ফুটপাত দিয়ে আসছেন — একদম চোখাচোখি। কিছু বলেন নি, কিন্তু নিজের বে-আদাবিতে লজ্জা পেয়েছিলাম। ভারতীদির ক্লাস একটা আকর্ষণ। নাটক পড়াতেন, ছন্দ-অলঙ্কার পড়াতেন। ঝলমলে ক্লাস। ঝর্ণাদিকে ভয় পেতাম, কিন্তু পরে আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাংলায় সাতজন দিদি পড়াতেন। বিনতাদি-ই তখন বয়সে দিদিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। প্রথমদিন ক্লাসে এসে নিজের নাম বললেন — বিনতা চট্টোপাধ্যায়। কে যেন একটা জিজ্ঞাসা করলো —কী বললেন? একটু থেমে হেসে বললেন নিজের নামটা নিজের মুখে বারবার বলতে ভালো লাগে না। পড়াতেন মেঘনাদবধ কাব্য --- পদ্মানদীর মাঝি, বাংলা সাহিত্যের দুই ব্যতিক্রমী নক্ষত্র। চোখের সামনে নতুন দরজা খুলে যেত প্রতি ক্লাসে। একদিন বিনতাদির ক্লাসে দেরিতে ঢুকেছি সরস্বতী পুজোর প্রতিমা বায়না দিতে গেছিলাম। আমাদের কলেজের ভিতরে তখন পুজো হতো না ব্রাহ্ম কলেজ বলে — আমরা বাইরে প্যান্ডেল করে পুজো করতাম। সেই সময় জানতে পারলাম আমাদের শিক্ষকদের অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। বিশেষত সায়েন্সে অঙ্ক করাতেন সুপ্রীতিদি — ওঁরা চাঁদা দিতেন না। এদিকে আমার নিজের বাড়িতে পুজো নেই — আমিই বন্ধ

করেছি উদ্যোগ নিয়ে — আমি হলাম কলেজের পুজোর পান্ডা! বিনতাদি বললেন — আসল সরস্বতীকে ছেড়ে মাটির সরস্বতীর পুজো! সমষ্টি জীবনে কতো যে আপোস করতে হয়! জনসংযোগের জন্য পুজো। সেখানেও মীরাদি সাহায্য করেছেন। পুজোর পুরোহিত পাওয়া যায় না — পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি — মীরাদি বললেন পুরোহিত ছাড়া পুজো করো — শুক্লাদি (সংস্কৃতের) সুন্দর সরস্বতী মন্ত্র বলবেন — ভালো পুজো হবে। আর পুজো নিয়ে ভাবিনি এরপরে। কল্পনাদি প্রিন্সিপাল, তাঁর কোয়ার্টার ছিল আমাদের ঐ অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে দশ নম্বর ঘরের ওপর। ড. বিশুই ছিলেন সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক, তাঁকে সবাই সেখানে 'লর্ডদা' বলতেন শুনেছি — আমার বন্ধু সেই প্রথম যে তিনজন এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তার অন্যতম চৈতালি — ওর বাবা আমাদের পিতৃপ্রতিম মেসোমশাই ড. রঙ্গলাল ভট্টাচার্য ছিলেন সাহা ইন্সিটিটিউশানের বিজ্ঞানী। আমার ছেলে বলতো বিজ্ঞানী দাদু। তাঁর কাছে শুনেছিলাম — 'লর্ডদা'-র নাম!

মাঠ ঘিরে যে পাঁচিল ছিল তার ওপর ছিল আমাদের অফ পিরিয়ডের আড্ডা, ওপরে জামগাছ। জামগাছটা এখন নেই, পাঁচিল উঁচু হয়ে আড্ডার রাস্তা বন্ধ। সবই তো বদলে যাওয়ার কথা, বদলেছেও — তবু এখনো ফিরে আসি — কী প্রার্থনা নিয়ে বারেবারে আসি — বসি ঐ দেবালয়ের সিঁড়িতে! চারিদিকে অনেক কিছু অনেক মানুষই নতুন, তবু মনে হয় না কেন নিতান্ত outsider! আমরা যখন ছাত্রী বিনতাদির ছেলে তখন ছোট। একদিন বিনতাদির সঙ্গে দেখা হলে তার কথা জানতে চাইলাম — বললেন সে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে চাকরি করে — বললাম সত্যি তো কতদিন কেটে গেছে আমরাও তো বুড়ো হয়ে গেলাম। বিনতাদি বললেন — নিজের যে বয়েস বেড়ে গেছে সেটা কি নিজের মনে হয়? মনে হয় না — মনটা একই রকম থকে। সত্যি — মনটা একই রকম থাকে বটে। সেই একইরকম থাকা মন বারে বারে ফিরে যেতে চায় আটাত্তর বি, এ.পি.সি. রোডের লোহার দরজায়। কেশব মেমোরিয়াল হলে, লাইব্রেরিতে, নবদেবালয়ে, আর — আর ক্লাসরুমেও? এ জীবনে পাঠ নেওয়া শেষ হয়নি এখনো — কবে শেষ হবে জানা নেই।

নস্টালজিয়া

অপরূপা চ্যাটার্জ্জী
সাধারণ বিভাগ (১৯৮০)

ধান ভানতে শিবের গীত

বাংলার ইন্দ্রাণীদি কলেজের প্রাক্তনী আণবিকাকে কলেজের পত্রিকায় কিছু লেখার ফরমাশ করেছিলেন। আমি কিছুটা যেচেই বলেছিলাম, "আমিও কলেজের পত্রিকায় লেখা দেবো।" লেখা মোটেই আমার আসে না। তাও আমার কলেজের পত্রিকা। যেচে পড়েই লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। ইন্দ্রাণীদি বলে দিয়েছেন কলেজ নিয়েই। অর্থাৎ আমাদের সময়, এখানকার প্রাক্তনী হিসেবে আমাদের অনুভবই লেখার বিষয় হতে হবে। লিখতে গিয়ে কত কথাই মনে আসছে। চেষ্টা করছি সংক্ষিপ্ত করতে। কিন্তু বেড়েই চলেছে।

আমার ভিত্তি

এই প্রাঙ্গণের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সেই ক্লাস ফাইভ থেকে গ্রাজুয়েশন। তারপর কর্মজীবনের সুদীর্ঘ ক'বছরও কাটিয়েছি এই প্রাঙ্গণে। যে প্রাঙ্গণে সাধক-পুরুষ রামকৃষ্ণ ভাব-সমাধি লাভ করেন। বহু নামী-দামী-গুণী মানুষের পায়ের ধুলোয় সমৃদ্ধ এই ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশান (স্কুল)-এর প্রাক্তনীও বটে। স্কুলের বয়স ১৫৩ বছর। কলেজের সম্ভবত ৯২। সে সময়ের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

অনিবার্যভাবে এ প্রসঙ্গে আমার বাবার কথাও মনে পড়ে। বাবা চেয়েছিলেন এমন এক স্কুলে মেয়েকে পড়াতে যেখান থেকে স্কুল শেষ করে কলেজে গ্র্যাজুয়েশন করে বেরোতে পারে। মানিকতলার কাছে যুগীপাড়ায় থাকতাম। এ.পি.সি. রোড ক্রস করে উল্টোদিকের ফুটপাত ধরে হাঁটা লাগালেই রাজাবাজার ক্রসিং, তারপরই আমার ইন্সটিটিউশান। আমরা দুই বোনই এই স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ছিলাম। বোনও আর নেই। আর বাবা আমার মাধ্যমিকের দশদিন আগে গত হন। আমার গ্র্যাজুয়েশন তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

স্মৃতিকথা

আমি এই স্কুল থেকে মাধ্যমিকের প্রথম ব্যাচ। তারপর ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজে এলাম। তখন একাদশ-দ্বাদশ কলেজে পড়ানো হতো। স্কুল ছেড়ে কলেজ, একটা ডানা-পাখনা-মেলা-ফিলিং, কত স্বাধীনতা! এক ক্লাসে, এক জায়গায় টানা বসে থাকার ব্যাপার নেই। বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন রুমে পড়ানো হয়। এক ক্লাস থেকে হৈ হৈ করে অন্য ক্লাসে যাওয়া। ইচ্ছে হলে ক্লাসে না ঢুকে কমনরুমে আড্ডা মারার স্বাধীনতা। মাঠে সিমেন্টের ধাপ্পিতে পা দুলিয়ে গল্প করার স্বাধীনতা!

মনে আছে আমাদের ছায়াদি ইতিহাস পড়াতেন। প্রথম দিন ছায়াদি ক্লাসে ঢুকেই বললেন যে, আমরা স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি বটে, কিন্তু আমরা স্কুলের গন্ডি পেরোইনি এখনো। আমরা যেন কলেজে পড়ার স্বাধীনতায় ভেসে না যাই। ছায়াদিই বলেছিলেন, "স্বাধীনতা পেয়েছো, তার মানে তার অপব্যবহারের অধিকার জন্মায় না। যা করবে, তার দায়িত্ব তোমাদের। তার ফল তোমরাই ভোগ করবে।"

দ্বাদশ ভালোভাবে পাশ করে গ্র্যাজুয়েশান করতে ঢুকলাম। প্রথমে অনার্স নিলেও পরে ছেড়ে দিই। বাবা মারা গেছেন। কাকাই আমাদের যৌথ পরিবারের অভিভাবক। তাঁর চাপ কিছু কমাতে চেয়েছিলাম। বেশ ক'টি টিউশানি করতাম। অনার্স নিলে আমি সেটা করতে

পারতাম না। পরে মাস্টার্স ও বি.এড করে এই স্কুলেই শিক্ষকতা করি।

প্রথম প্রথম খুব অবাক লাগতো। কলেজে প্রতিটি ক্লাসে দিদিরা রোল-কল করতেন। তখনই জেনেছিলাম 'প্রক্সি' কাকে বলে।

আমরা অধ্যাপিকাদের 'দিদি' বলেই ডাকতাম। 'ম্যাম্' বলার রেওয়াজ সেসময় আমাদের মতো বাংলা মাধ্যমের মেয়েদের ছিল না। কল্পনাদি, স্নিগ্ধাদি, অনিতাদি, বিনতাদি, পদ্মাদি, ছায়াদি, পুরুষ অধ্যাপক ছিলেন প্রোঃ মুন্সী।

মনে আছে ছায়াদি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। খুব লম্বা। রাশভারী চেহারা। তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের 'রিকন্সট্রাকশান অব্ ইউরোপ'' পড়াতেন। প্রথমেই তো দিদিদের নাম জানতাম না। আমরা ছাত্রীরা ওনার নাম দিয়েছিলাম — রিকন্সট্রাকশান অব্ ইউরোপ।

ইংরেজী পড়াতেন স্নিগ্ধাদি। উনি মাইক্রোফোন ব্যবহার করতেন। ওনারও তখন নাম জানি না। ওনার নাম নতুন ছাত্রীরা দিল — মাইকবক্স। স্নিগ্ধাদির শান্ত, স্নিগ্ধ চেহারা, খুব মিষ্টি স্বভাব। কখনো ক্লাসে চেঁচামেচি করলেও, উনি কখনো উঁচু গলায় কথা বলতেন না। কেবল একবার তাকাতেন। তাতেই সব চুপ।

আর অনেক দিদিরাই পড়াতেন। এঁদের মধ্যে ফিলজফির পদ্মাদি, রত্নাদি। বাংলার বিনতাদি, নীলাদির নাম মনে আছে। নীলাদি সুগায়িকা ছিলেন। খুব মিষ্টি সুরেলা গলায় রোল কল করতেন। বয়সজনিত স্মৃতি-দৌর্বল্যে সব দিদিদের নাম মনে নেই। কল্পনাদি প্রিন্সিপাল।

কলেজ রাজনীতি

এ ব্যাপারটি আমার কাছে সেসময়ে বেশ মজার ছিল। আমার মানে আমার বন্ধুদের কাছেও। আমি বরাবরই সক্রিয় রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকতাম। সে সময়ে আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিছু দেখেছি। রাজনীতি না করলেও রাজনৈতিক চুলোচুলিও দেখেছি। তো সেরকমভাবে আগের দিন কোনো র‍্যালিতে যাবার প্রস্তাব এলে পরের দিন আমরা অবধারিত কলেজ বাঙ্ক করে নুন শোয়ে সিনেমা দেখতে চলে যেতাম।

মাঠের কথা

কলেজের মাঠ। তার বাউন্ডারি ছিল আমাদের অক্সিজেন। আর মাঠে ছিল বাস্কেটবল বোর্ড --- দুপ্রান্তে। প্রতি রবিবার ছিল প্র্যাক্টিস। কমনরুমে ড্রেস চেঞ্জ করে আমরা মাঠে বাস্কেটবল প্র্যাকটিস করতাম কোচের তত্ত্বাবধানে। ইন্টার-কলেজ-টুর্নামেন্টও হত। ঐ মাঠেই জলের ট্যাঙ্কের মাথায় ছাতার মতো ছিল একটা কদম গাছ। বেশ লাগত ঝাঁকড়া চুলো কদমফুলে ভরা গাছটি। সেটি এখন নেই। যার আশ্রিত শুয়োঁপোকার রোঁয়া গায়ে ওঠেনি, এমন ছাত্রী বিরল ছিল।

কেশব মেমোরিয়াল হল

কেশব মেমোরিয়াল হল --- আমাদের স্কুল-কলেজের সম্পদ। খুব কম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এমন সুন্দর হল আছে।

আগে হলের দোতলায় বসেও নানা অনুষ্ঠান দেখেছি। একবার নাট্য-ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এসেছিলেন এক সেমিনারে। যতদূর মনে আছে গৌরীদি ছিলেন উপস্থাপিকা। আমি সম্ভবত তখন স্কুল-পড়ুয়া।

আমাদের হলে নানা অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত মানুষদের দেখেছি। লেডি রাণু মুখার্জী, বিদুষী ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ বিধান রায় ছিলেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক। যদিও তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

নবদেবালয় ও কমল কুটির

১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন পরলোকগত হবার এক সপ্তাহ আগে এই 'নবদেবালয়' উদ্বোধন করেন।

ছাত্রী থাকাকালীন সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। পরে শিক্ষিকা থাকাকালীন ও প্রাক্তনী হিসেবে

দেবালয়ে গেছি। ওখানে গেলেই এক অদ্ভুত প্রশান্তি বিরাজ করে। কেশব সেন ও তাঁর পরিবারের সকলের স্মৃতি-সমাধি এখানে আছে।

বহু মনীষী সমাগমে পুণ্য এ স্থান. দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ বহুবার এ বাড়ীতে এসেছেন। তাঁর দু'হাত তুলে যে দিব্যোন্মাদ ভঙ্গী তা এ বাড়ীতেই প্রথম হয়। এই বাড়ী, এই প্রাঙ্গণ যা ইতিহাসে 'কমল কুটির' (Lilly Cottage) বলে বিখ্যাত।

কাল-আজ

কাল আর আজের প্রথম পার্থক্য যা চোখে পড়ে তা হ'ল শিক্ষক-ছাত্রীর ভাব-গম্ভীর দূরত্ব ততটা নেই।

নতুন বিল্ডিং, নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে যা আমাদের সময় ছিল না।

শুনেছি লাইব্রেরি কম্পিউটারাইজ্‌ড হয়েছে। আমাদের সময় লাইব্রেরি ছিল। কিন্তু এখন নাকি তার আধুনিকীকরণ হয়েছে।

'সুনীতি সভাঘর' নামে কলেজের নিজস্ব এ.সি. হল হয়েছে। এখন অনেক সেমিনার সেখানে হয়ে থাকে।

এই ইন্সটিটিউশানের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ গভীর এক সম্পর্ক। প্রাক্তনী হিসেবে আমি গর্বিত, সকল দিদিদের কাছে আমি ঋণী।

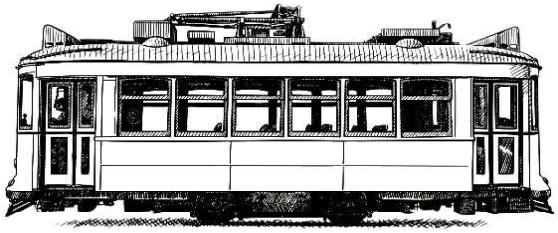

DEAD HEARTS

Bidisha Chakraborty
Semester VI ● English Department

With the lights glimmering far off the tall lifeless
apartments
The empty metro and the life creeping up
The local train
Aren't they all the part of life?
What would you call it?...
Beauty of life or the pathetic crawling of the human
existence...
The snobbish tangled lights of the windows or
the apathetic fire of the crowded feet?
The small touches or the big walls that separates
the goosebumps from reaching to one's soul?
Is love the only thing which
We are devoid of?
Or the humanity which
Is seeping out through the
Crack of our dead heart?

ছবি— শ্রুতি দত্ত ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

B(LAME) GAME

Aindrila Chakraborty
Semester IV ● English Department

Prithee turn the leaves slow
Of her album apprised
Let the memories flow
Of times vaguely embedded
In undulating spots and blinds
Of memories enmeshed in recesses deep
Of her twisted weary soul.

Twisted but weary though!
For she wants to show the world
How she rows her own boat
When there're fellowmen besides.
Who contribute so less
-So she can boast of her labours later.

So she can boast of her labours later -
How she plucked the strings right.
Played the instrument well:
And dictating instructions.
Instinctually directed the blind choir.
While directing the choir blind.
She had coded for them their ways
But behold the end of her good days
When tides turned and a cyclone emerged.

When tides turned and a cyclone emerged.
The mishap was blamed on account of hers.
For blind they were in eyes and in ears.

Wounded. she took hold of her shield -
In its metallic canopy masking herself

In the veil of a lady supreme

A Superwoman She. She's me!

(And I seldom find myself trying to be.
What people state I cannot be..)

ছবি— উর্মি পাত্র ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

INFERIORITY COMPLEX

Abhilasha Parui
Semester IV ● English Department

Sometimes I sit so quiet in class
That I can hear my sparkle die.
Drowning in the competitive glee,
My confidence caved in last July.

I know it is not compulsory
To always shine amidst the crowd.
But most days I don't even hear my name
While others' become too loud.

I came in today without a sound,
Went so unnoticed I thought I lost my voice.
I hate myself for hopelessly
Trying to be someone's first choice.

But I do not really try, do I?
To curry favours with the ones I love,
I just sit back and be myself
And realise being liked is tough.

When all I'm doing is just trying
To squeeze through preoccupied territory,
Her heart has already been won
By numerous of us in the same category.

Yet sometimes I blame people
For making me believe,
That I am someone special in their eyes
Yet the whole time being fed with deceit.

Or maybe, it is just me and my
Odd sense of personal concepts,
Not realising how deep seated
In my mind is this inferiority complex.

How do I grow when I feel less than them?
What do I do with all this self doubt?
Writing about it all in rhymes
Perhaps, is the only growth that counts.

THE NIGHT BIRD SINGS

Sucharita Chowdhury
Semester IV ● English Department

I opened the window one night,
To see the beautiful night sky
Suddenly, my eyes caught two Night Birds.
I heard them singing with melodious tunes.

The moonlight wrapped them with its liright light.
The breezes chened them for making sucha blissful night.
Flowers were blooming with their cherished feelings
And the leaves were glittering.

Thus the Night Bind's Song,
Filled the dark,
With a musical umark.
Marking the dank night heavenly,
And cheering me gracefully.

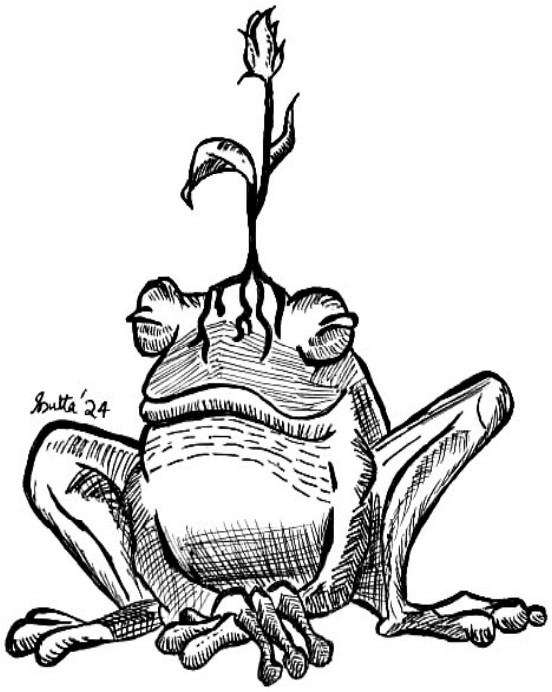

ছবি— শ্রুতি দত্ত ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

RUNNING AWAY?

Bidisha Chakraborty
Semester VI ● English Department

"I am leaving...", he said
"Running away?" I countered.
"I would not say that Charu...
I am going out to live."
"If one day you and I are far away...
I, in a nameless village and you
Smoking a cigarette in an empty street
of Paris
And have totally lost touch of each other...
Will my name ever come to your mind?"
I asked looking into his eyes.
He smiled. "We grew up so fast, isn't it?"
"From borrowing your sweater to one day
Becoming complete strangers", I said
holding a tear.
"I will be in the fragments of your heart.
These
small moments will be etched in my veins
forever."
I looked at the moon, he said something
And I never heard of him again.

ছবি— প্রিয়া দাস ● দ্বিতীয় সেমিস্টার ● সংস্কৃত (মেজর)

DESTINATION KALA PANI

Sreya Das

Semester IV ● English Hons.

I still remember the day as fresh as yesterday, October 30th, Monday. The only thing that made it special was it being a trip to a destination we had been planning for quite some time

Andaman

I am a mountain person and have been to many sea shores to reconsider my decision but after I visited Andaman, I knew I had to make an exception for it.

Generally people research about the place they are going to visit, I always leave that up to my father. For me, every trip is an adventure with sudden surprises.

On the morning of our arrival, Andaman greeted us with scorching rays, damped roads and a bright rainbow. The rays made me slightly disappointed as it was way hotter than Kolkata Moreoever, my disappointment further increased when I realized we had to leave within an hour or so after checking into our hotel. My jetlag was urging me to hit the bed but apparently nightlife was reserved for rest in Andaman. You are free to roam in the daylight for there is no availability of electricity in main tourist spots.

With a mild consolation to my tired-self, I forced myself to freshen up and get ready, reminding how this trip was a much anticipated one.

The first spot that we reached was Corbyn Cove's Beach, a famous spot for trying out water sports. We were a 15-member team of family and friends, understandably very close. Still not close enough that they could not even interpret my sunken jetlagged face and kept urging me to try one.

However, our driver came to my rescue, prompting us to leave for the next spot. I already imagined it to be another beach with white, shiny sand with corals and sea-shells lying around and my parents thinking me to be a professional stunt person ready for a water stunt.

If not worse, our driver tried to know our music taste by playing some high-pitched Bhojpuri music. No offense to anyone but it was definitely not helping my mood.

When we arrived, I looked out to find it a road with not many people on it. I could not hear any waves like the last spot, yet I knew it was only a few steps until the sand entered my slip- ons.

After following my team, shock washed over my features. Why in the world were we before a jail? Yes, a jail on a TRIP!

I expected everyone sharing the same reaction when I realized I was the only

fool surprised. My group was busy clicking pictures when we were handed tickets and pushed inside. I have never been in a jail (not that I ever want to) but something about the concrete brown walls said that it was way more than what met the eye.

My cars met my father's voice. It was he who narrated the whole memorized story he found on wikipedia, yet, it took all my attention.

It was the cellular jail where the cruel British colonizers threw our freedom fighters so that they could never escape the island. Due to the harsh nature of the islands and very little hope of surviving the punishment, this very place was referred to as "Kala Pani" jail where the last sentence would have public execution by hanging.

A chill ran down my spine. We stepped inside a cell, gloominess clogging the air. The cell where a prisoner was kept, was enough for a person to go mentally unstable. It was dark with no lights present and only a small opening as high as touching the ceiling for air to come in, even protected by metal bars.

A small gap was made near each cell gate for food which was not given on proper intervals, and what was given was not even considered eatable. It consisted of sand, rocks, roaches and other insects. It is also said that water was contaminated and stank. It led to several hunger strikes and many more scarring tortures. Most died due to the forced feeding by the British agents, and as to irony of fate, their bodies were secretly thrown into the sea; to observe the last rites, no one but the blustering waves embraced them into their watery graves, However. their deaths and heroic struggles reached each and every corner of India and upset every Indian that even Rabindranath Tagore and Gandhiji sent cables requesting the freedom of the prisoners.

The Jetlag was far forgotten as if it never existed. We visited the cells of celebrated protestors like Vinayak Damodar Savarkar after which the airport has been named.

It was horrifying to imagine that how these walls used to roar with painful screams and a mute witness to the death of some, insanity to others and general strike of the prisoners.

We passed several torture chambers with engraved names of the fighters and displayed statues of the punishments that can make any sane person kill themselves. Trust me when I say every three prisoners in the jail committed suicide every month

We caught many tourists crowding at a white structure built at the rightmost side of the jail. After reaching it, every nerve of my body seemed to freeze for it was the hanging room where the public execution took place.

A sudden horn shook us. It was the alarm for exiting the jail. I was disappointed for not arriving here earlier.

However, my father reminded us of an outstanding light and sound experience after a break. We waited outside while the gates closed, and saw many street vendors selling snacks just like our cities and towns, the only difference being the doubled price.

The light and sound experience was a 45-minute-watch and shook every Indian to the core. The click of shackles, the blood-curling cries, the harsh voices of the British and the unbelievable tortures. Can you believe the prisoners were not given a drop of water for 2 days if they defied an order? This led to fighters tearing their shirts and hanging themselves out of sheer frustration.

The projectors were so finely positioned that it made me feel like I was a witness myself, a prisoner myself.

At the end, the show was wrapped up in the tunes of the national anthem coloring the walls with tri-colors. I still recall how my body trembled under the familiar tunes with every Indian singing it out loud.

The patriotic air stayed around u the whole night and I could not stop sharing it with my friends.

The night womewhat changed my ching abo research amped my percept this trip. Perhaps. I was righe f this place earlier

The following week was filled with much mores were exploring cas, vagong new islands, watching moving shells, natural coral reefs, a huge ton of colorful fishes I only saw in expensive tanks, diving into the blue sea, oustanding, sunsets, stunning sunrises and most lavish of all, having our own isolated private beach!

The experience of watching a Wind-Cup munch at beach cottages and rating cropond wathy was a showing cheery on top.

Soon a week weet was heartfeesking to know that our trip had come to an all and it wat our time to leave for the City of by. However, to cheer us up, our travel agent prepared for *biriyani* the last night.

I took a last glance at the roads, at the local people, at the curvy roads of the island with moistened eyes and composed myself.

Even after my mother's countless reminders to carefully check before my departure, I knew I was leaving a part of myself behind, at the sea shore, while looking at the sunset I kept reminiscing about the Dane Islands, which were nothing but a nightmare to our ancestors.

ছবি— দেবীশা নন্দী ● চতুর্থ সেমিস্টার ● ইংরাজী অনার্স

KESHUB MEMORIAL HALL